Vol. 59 | No. 1-2 | 2024

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সরদার জয়েনউদ্‌দীনের ছোটগল্প: গ্রামীণ সমাজবাস্তবতার চালচিত্র

Volume	59
Issue	1-2
Year	2024
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Mst. Shirina Khatun
Published online	December 31, 2024
DOI	10.62328/sp.v59i1-2.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v59i1-2.8
Pages	157-175
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

Journal.bangla.du.ac.bd
Print ISSN: 0558-1583
Online ISSN: 3006-886X
বর্ষ: ৫৯ সংখ্যা: ১-২
ফাল্গুন ১৪৩০॥ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০২৪
Issue DOI: 10.62328/sp.v59i1-2

DOI: 10.62328/sp.v59i1-2.8
প্রবন্ধ জমাদান: ১৫ জানুয়ারি ২০২৪
প্রবন্ধ গৃহীত: ৫ মে ২০২৪
পৃষ্ঠা: ১৫৭-১৭৫

সরদার জয়েনউদ্দীনের ছোটগল্প: গ্রামীণ সমাজবাস্তবতার চালচিত্র

মোছা. শিরিনা খাতুন

প্রভাষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়

ইমেইল: shongbrita.shirina.du@gmail.com

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সরদার জয়েনউদ্দীন (১৯১৮-১৯৮৬)। বিভাগোত্তর কাল থেকে বাংলাদেশের ছোটগল্পে তিনি চিত্রিত করেছেন গ্রামীণ সমাজবাস্তবতার নিখুঁত চালচিত্র। গ্রাম-সমাজের নানা অনাচার-অসংগতি, পরিশ্রমজীবী মানুষের দুর্ভোগ, দারিদ্র্যের নির্মম কশাঘাত, সামন্ত শ্রেণির শোষণ-নির্যাতন, নারীর ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবন তাঁর ছোটগল্পের ক্যানভাসে শিল্পরূপ পেয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে *নয়ানঢুলী* (১৯৫২), *খরস্রোত* (১৯৫৫), *বীরকণ্ঠীর বিয়ে* (১৯৫৫)—পঞ্চাশের দশকে প্রকাশিত এই তিনটি গল্পগ্রন্থ অবলম্বনে গ্রামীণ সমাজবাস্তবতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে।

মূলশব্দ

সমাজবাস্তবতা, পঞ্চাশের দশকের গল্প, গ্রামীণ সমাজ, শোষণ ও প্রতিবাদ, নিম্নবিত্ত শ্রেণি, নারীজীবন, সামন্ত শ্রেণি।

বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের কীর্তিমান গল্পকার সরদার জয়েনউদ্‌দীন (১৯১৮-১৯৮৬)। উপন্যাস ও ছোটগল্প—উভয়ক্ষেত্রে বিচরণ থাকলেও বাংলা কথাশিল্পের জগতে তাঁর প্রারম্ভিক আত্মপ্রকাশ একজন গল্পকার হিসেবেই। ছোটগল্পের প্রকরণগত সফলতা নয়, বরং তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন ছোটগল্পের শিল্পাঙ্গিকে গ্রামীণ সমাজবাস্তবতার বিশ্বস্ত রূপায়ণ-সূত্রে। তাঁর বেশির ভাগ গল্পের প্রধান উপজীব্য গ্রাম। কবির তুলিতে আঁকা পল্লি-প্রকৃতির নান্দনিক অনুষঙ্গ নয়, তিনি অবলোকন করেছেন গ্রামীণ মানুষের যাপিত জীবনের বহুবিচিত্র সংকট। শ্রেণিবিভাজিত সমাজে মৃত্তিকামূল-ঘনিষ্ঠ সাধারণ মানুষের ওপর কীভাবে নেমে আসে জোতদার-মহাজনের অমানবিক নিপীড়ন, তাদের কীভাবে বঞ্চিত করে শোষক ও শাসক শ্রেণি, ধর্মের নামে নারীকে কীভাবে মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য করে মোল্লা-পুরোহিত, তা গ্রামীণজীবনে বসবাস-সূত্রে প্রত্যক্ষ করেছেন সরদার জয়েনউদ্‌দীন, এবং বাস্তবসম্মত উপায়ে উপস্থাপন করেছেন তাঁর ছোটগল্পে। সরদার জয়েনউদ্‌দীনের গল্পগ্রন্থ পাঁচটি—*নয়ানঢুলী* (১৯৫২), *খরস্রোত* (১৯৫৫), *বীরকণ্ঠীর বিয়ে* (১৯৫৫), *অষ্টপ্রহর* (১৯৭০), *বেলা ব্যানার্জীর প্রেম* (১৯৭৩)। পাকিস্তানি শাসনামলে প্রকাশিত প্রথম তিনটি গল্পগ্রন্থের প্রায় সব গল্পেই গ্রামীণ জীবনে বিরাজিত বাস্তবতার চালচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। শেষ দুটি গল্পগ্রন্থে জয়েনউদ্‌দীনের গল্পের পট-পরিসর শহর-জীবনভিত্তিক। এগুলোতে গ্রামীণ জীবনচিত্র এসেছে বিচ্ছিন্ন সূত্রে। বর্তমান প্রবন্ধে *নয়ানঢুলী, খরস্রোত, বীরকণ্ঠীর বিয়ে*—এ তিনটি গল্পগ্রন্থ অবলম্বনে গ্রামীণ জীবনবাস্তবতা অনুসন্ধানের প্রয়াস গৃহীত হয়েছে।

সরদার জয়েনউদ্‌দীন প্রধানত গ্রামীণ জীবন ও সমাজের কথাকার। গ্রাম-সমাজের প্রায় প্রতিটি মুদ্রা তিনি অবিকল শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। সমাজকাঠামোর রন্ধ্রে রন্ধ্রে জেঁকে বসা শাসন-শোষণ, দলন-পীড়ন, দারিদ্র্য-দুর্ভিক্ষ, সহায়সম্বলহীন মানুষের ওপর সমাজশক্তির নির্দয় আঘাত, তাদের স্বপ্ন-দুঃস্বপ্ন ও বেদনাময় জীবনযাপনের প্রতিচ্ছবি তাঁর গল্পে শিল্পমূল্য পেয়েছে। তবে কেবল সমাজ-সংকটই নয়, সংকট থেকে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষাও তিনি ব্যক্ত করেছেন তাঁর ছোটগল্পে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, সরদার জয়েনউদ্‌দীনের জন্মস্থান বাংলাদেশের পদ্মা-তীরবর্তী পাবনার কামারহাটি গ্রাম। তাঁর শৈশব ও কৈশোর কেটেছে সেই প্রত্যন্ত গ্রামের আলো-হাওয়ায়। ফলে তাঁর গল্পে অনিবার্যভাবে প্রতিফলিত হয়েছে কামারহাটির মানব-ভূগোল, তাদের পটপরিবেশ, বিশ্বাস-সংস্কার, জীবনযাপন-চিত্র প্রভৃতি।

সরদার জয়েনউদ্‌দীন বেড়ে উঠেছেন উপমহাদেশের আর্থ-রাজনীতির এক উত্তাল সময়খণ্ডে। বঙ্গবঙ্গ, বঙ্গভঙ্গ-রদ, ব্রিটিশ বিরোধী তৎপরতা, স্বদেশি আন্দোলন, মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ ও স্বাধীনতা সংগ্রাম, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ভারত-বিভাগ প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষ তথা পূর্ববঙ্গের পরিস্থিতি ছিল টালমাটাল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা (১৯২১), মুসলিম সাহিত্য সমাজ গঠন (১৯২৬), প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ (১৯৩৯)-সহ বিভিন্ন সংগঠনের অন্তর্শক্তিজাত তাড়নায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ প্রভৃতি পূর্ববাংলার সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে একটি স্বাতন্ত্র্য রূপ গঠনে সহায়ক হয়। এই পরিস্থিতিতে ১৯৪৭ সালে ভারতভাগ হয় এবং গড়ে ওঠে পাকিস্তান রাষ্ট্র। কিন্তু দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পাকিস্তান রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে এ দেশের জনসমাজ যে সুখস্বপ্নে আন্দোলিত

হয়েছিল তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হতে শুরু করে। সঙ্গত কারণেই নবীন রাষ্ট্র পাকিস্তানে শিক্ষিত ও সারস্বত শ্রেণি স্বতন্ত্র পথ অনুসন্ধানে ব্রতী হয়। ধর্মকে উপজীব্য করে গঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্র শুরু থেকেই ছিল এ অঞ্চলের সাধারণ কৃষিজীবী মৃত্তিকালগ্ন এবং নতুন সৃষ্ট শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিকূল অবস্থানে। তদানীন্তন মুসলিম লীগ সমর্থনপুষ্ট জমিদার, ভূস্বামী ও ব্যবসায়ী ধনিক শ্রেণির স্বার্থরক্ষায় নিয়োজিত শাসক শ্রেণির নানা কর্মকাণ্ড সাধারণ মানুষের যাপিত জীবনকে অস্থির ও অস্থিতিশীল করে তোলে। দেশ-বিভাগোত্তর সময়ে সমাজ-শাসনের কেন্দ্রশক্তি হিসেবে নিজেদের অবস্থান আরো সুদৃঢ় করে জোতদার-ভূস্বামী, মোড়ল-মাতব্বর শ্রেণি; এরা ধর্মের নামে নিম্ন আয়ের জনগণের ওপর কায়েম করে নিজেদের আধিপত্য। পাকিস্তানি শাসকদের এই অপশাসন প্রক্রিয়া গ্রামীণ জনজীবনকেও আন্দোলিত করে। শোষণ-বৈষম্যের জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে তারা কখনো সরব আবার কখনো নীরব প্রতিবাদে জেগে উঠতে শুরু করে। পরিবর্তিত এই প্রেক্ষাপটকে ধারণ করেই শুরু হয়েছে সরদার জয়েনউদ্‌দীনের সাহিত্যযাত্রা।

বাংলাদেশের বৃহত্তর সমাজজীবন প্রধানত গ্রামনির্ভর। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে অবলম্বন করে গ্রামনির্ভর এই সমাজ কাঠামোর মৌল বৈশিষ্ট্যসমূহ নির্মিত। ভূমিহীন কৃষক ও ভূমির মালিক শ্রেণির সামাজিক অবস্থানগত ব্যবধান, সামন্ত শাসনব্যবস্থায় নিম্নবর্গের মানুষের দুর্বিষহ জীবন, কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের ওপর জোতদারদের শোষণ ও অত্যাচার, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সমাজরক্ষা ও ধর্মীয় বিধি-নিষেধের নামে নারীর প্রতি অবমূল্যায়ন ও নিপীড়ন, অর্থনৈতিক হতদশা প্রভৃতি এই গ্রামীণ সমাজের নিত্যকার বৈশিষ্ট্য। এই গ্রামীণ সমাজবাস্তবতা বিভাগোত্তর কালের যেসব গল্পকারদের শৈল্পিক প্রকরণে প্রাধান্য পেয়েছে, সরদার জয়েনউদ্‌দীন তাঁদের অন্যতম। গ্রামীণ পটভূমি-কেন্দ্রিক কাহিনি নির্বাচন ও চরিত্রসৃষ্টির মধ্য দিয়ে প্রথম পর্যায়ের কয়েকটি গল্পগ্রন্থে গ্রামীণ সমাজবাস্তবতার রূপাঙ্কনই গল্পকার জয়েনউদ্‌দীনের অন্বিষ্ট। বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে প্রকাশিত তাঁর স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত তিনটি গল্পগ্রন্থ—*নয়ানঢুলী, খরস্রোত, বীরকণ্ঠীর বিয়ে*তে সংকলিত গল্পসমূহে এই বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট।

এক

সরদার জয়েনউদ্‌দীনের প্রথম গল্পগ্রন্থ *নয়ানঢুলী* বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবন ও সমাজের উপস্থাপনায় সমৃদ্ধ। এ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সর্বমোট সাতটি গল্প—‘করালী’, ‘ভাবী’, ‘কানা ফকিরের ব্যাটা’, ‘ফুলজান’, ‘কাজী মাস্টার’, ‘সবজানের সংসার’, ‘নয়ানঢুলী’। সামন্ত ভূস্বামীর নির্মম নির্যাতনের আলেখ্য ‘করালী’। আপাতদৃষ্টিতে প্রধান চরিত্র করালীর ব্যক্তিক জীবন ও পারিবারিক বিপর্যয় বর্ণিত হলেও গল্পের অন্তর্লোকে গ্রন্থিত হয়েছে গ্রামীণ সমাজের বিবিধ অনুষঙ্গ। গাঁয়ের চাষাভুষার সন্তান করালীর জীবন-জীবিকার অবলম্বন জমিদারের পেয়াদাগিরি। ক্ষেত্রবিশেষে জমিদারের অনৈতিক লালসা নিবৃত্তির প্রয়োজনে অন্যায় করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না সে। কিন্তু ভাগ্যের ফেরে জমিদারের লোলুপ দৃষ্টি লেলিহান শিখারূপে একসময় তারই সুখী দাম্পত্য জীবনকে নিঃশেষ করে দেয় নিমেষে। রাতের অন্ধকারে স্বগৃহে স্ত্রীকে খুঁজে না পেয়ে ‘তীর-খাওয়া পাখী’-সদৃশ শঙ্কাতুর করালী ছুটে যায় জমিদারের কাছারি বাড়ি:

> দৌড়িয়ে যায় করালী কাচারিতে; জমিদারবাবু রাতে চলে গেছে। কাচারি ঘর ফাঁকা। করালী ফিরে যাচ্ছিলো, ডাক দিল লালনদি পেয়াদা: কিরে করালী, এত সকালে যে? ব'লে লালন মিট্‌মিট্‌ করে হাসে। লালন সব জানে; সে নিজেই সাথে ক'রে নৌকায় তুলে দিয়েছে। ...

> লালন হাসি-মস্কারা ক'রে বলল, নিজের পাখী উড়েছে রে করালী, আজ নিজের পাখী উড়েছে। আঁতে বুঝি খুব ঘা লেগেছে? ক্যান সোনা দায়ানীর মেয়ে এনে দেবার সময় তো দেখতাম খুব-খু-ব মজা। বোঝ-বোঝ, এখন জারের মাসের কয়দিন যায়, কার খ্যাঁতা কে গায় দেয়। (সরদার ২০০৬: ১৩)

করালী অথবা লালনদি বরাবরই ছিল জমিদারের অপকর্মের সহযোগী। কিন্তু জমিদারের বাসনালোলুপ হীনদৃষ্টি থেকে তারাও রেহাই পায়নি। প্রকৃতপক্ষে জমিদার-জোতদারদের অনাচার যে সর্বগ্রাসী রূপ নিয়েছিল তা করালীর স্ত্রী জামেলার প্রতি জমিদারের আসঙ্গ লিপ্সার ঘটনা-সূত্রে অনুধাবনযোগ্য। অবশ্য আলোচ্য গল্পে গ্রামীণ সমাজকাঠামোর পরিবর্তনের সুরটিও ইঙ্গিতবহ করে তুলেছেন গল্পকার। করালীর স্ত্রী জামেলার অপহরণের ঘটনা-সূত্রে 'সেকেলে প্রধান' বৃদ্ধ উজির সরদারের অভিজ্ঞতালব্ধ জবানিতে উঠে এসেছে যুগে যুগে হতদরিদ্র প্রজার ওপর চলে আসা জোতদার শ্রেণির নির্যাতন প্রসঙ্গ। তাই তাঁর মতে, 'পানিতে থেকে কুমীরের সাথে ঝগড়া' করা ভালো নয়। কিন্তু নব্য যুগের প্রধান মানিক বিশ্বাসের অভিমত ভিন্ন:

> সেকাল নাই চাচা, জবাব দেয় মানিক বিশ্বাস। একাল আর সেকাল অনেক তফাৎ। তোমরা সেকালের লোক, একালের কথা ঠিক ধরতে পারবে না। যে দেমাক নিয়ে জমিদার ছড়ি ঘুরাতো, সে দেমাক এখন নাই।

> আর দুইদিন বেঁচে দেখ, জমিদারিই বাছাধনদের ফুস্‌। এখন তোষামদের যুগ না। আইন-কানুনের যুগ। দেখ তোমার জমিদারকে আমি এই ভাঙা ঘরের দেড়পয়সার করালীকে দিয়েই কেমন মাচায় তুলছি। (সরদার ২০০৬: ১৬)

'করালী' গল্পটিকে কেবল সামন্ত শ্রেণির নির্যাতনের আলেখ্য হিসেবেই সীমাবদ্ধ রাখেননি লেখক, বরং তাতে শিল্পায়িত হয়েছে গণমানুষের জেগে ওঠার প্রসঙ্গ। সময় বদলেছে। গ্রাম-সমাজের পোড়খাওয়া মানুষেরা তাই হয়ে উঠেছে সচেতন। যুগের পরিবর্তনকে বুঝতে চেষ্টা করেছে তারা। তাই তারা জমিদারের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে মামলা ঠুকে তাকে জব্দ করার পরিকল্পনা করে। ক্রুদ্ধ গর্জনে তাদের কেউ কেউ বলে, 'ঘরের বৌ নিয়ে ইজ্জত নিয়ে লীলা খেলা, এ আমরা সহ্য করবো না।' প্রকৃতপক্ষে এটি সেই সময়ের চিত্র, যে সময়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জমিদারি শাসন বলবৎ, কিন্তু পূর্বের মতো সুদৃঢ় নয় তার ভিত্তি। 'সামন্ত প্রভুদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে পল্লীর সাধারণ মানুষের মুখ থেকে যে বিদ্রোহের বাণী বেরিয়ে আসছে, তাদের মন থেকে যে রোষ আর ঘৃণা উপচে পড়ছে, তা থেকে সহজেই বোঝা যায়, অনেক দিনের সামন্ত শাসনের অবসান তখন স্বতঃসিদ্ধভাবেই হতে চলেছে' (আজহার ২০১৪: ১৫৫)। গভীর নিশীথে সদরে পুলিশের উদ্দেশে যাত্রাপথে নানা ভাবনায় দোলায়িত হতে থাকে করালীর ভাবনা-জগৎ। এ দেশের প্রেক্ষাপটে মামলা-মোকদ্দমার প্রকৃত বাস্তবতা উপলব্ধি করে সে জমিদার বাড়ি থেকে সুযোগ বুঝে জামেলাকে নিয়ে

পলায়নের ছক কষে। কিন্তু যদি তার স্ত্রী না আসে! ভাবনা-জগতের এই পরিবর্তনের সূত্রে করালীর আত্মভাষ্যে ফুটে উঠেছে সুতীব্র প্রতিবাদ:

> শালা জমিদার হইছো তো কি দু'নের আল্লা হইছো? তোমার চোদ্দগুষ্ঠির পিণ্ডি চটকাবো আজ। চুপ ক'রে থাকলিই বড় বাড় বাড়ে। অনেক থাকছি, আর না—এবার তোমার গুষ্ঠির ছেরাদ্দ। (সরদার ২০০৬: ১৯)

গ্রামীণ সমাজের পটভূমিকায় রচিত 'কাজী মাষ্টার' গল্পে অভিব্যক্ত হয়েছে 'ভিলেজ পলিটিক্সে'র প্রকৃত চেহারা। বাংলার গ্রামাঞ্চলে প্রায়শই মোড়ল-মাতব্বরদের দৌরাত্ম্যে নাজেহাল হয় প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। ছলে-বলে-কৌশলে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে নিম্ন আয়ের মানুষের ওপর সমাজপতিরা নির্মমভাবে চলমান রাখে তাদের বর্বরতা। গল্পের বাতাবরণে গ্রামীণ সমাজের এই বৈশিষ্ট্যকে শিল্পান্বিত করেছেন সরদার জয়েনউদ্‌দীন।

নিরীহ গোবেচারা কৃষক পরাণ। হাড়ভাঙা খাটুনির মাধ্যমে অর্জিত আয়ে দিনাতিপাত করে সে। গ্রামের কাজী মাস্টারের অনুপ্রেরণায় সে স্বপ্ন দেখে নিজের মেধাবী কন্যা ময়নাকে পড়াশুনা শিখিয়ে চাকরির যোগ্য করে তুলবে। কন্যা চাকরি না পেলেও অন্তত 'একটা চাকুরে জামাই তো হইবে!' কিন্তু তার এই মনোবাসনা ধূলিসাৎ হতে কালবিলম্ব হয়নি। গ্রামপ্রধান গণি মণ্ডলের লোলুপ দৃষ্টি পড়ে ময়নার ওপর। গণি মণ্ডল নিজের উন্মত্ত লালসা চরিতার্থ করার জন্য ধর্মকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে, এবং গ্রামের সরল মানুষদের বিভ্রান্ত করার অপপ্রয়াস জারি রাখে সর্বক্ষণ। গ্রামবাসীদের উদ্দেশে করা গণি মণ্ডলের উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে পরাণের স্বগতোক্তির মাধ্যমে গল্পকার প্রকৃত বাস্তবতা উন্মোচনে প্রয়াসী হয়েছেন:

> সমাজ বলিতে গণি মণ্ডল গাঁয়ের পেরধান। সে-ই সবকিছু। গোটা সমাজ কেন? গণি মণ্ডলকে হাদিস-কোরাণ যা ইচ্ছা বলিতে পার একচুলও ভুল হইবার উপায় নাই। নিজে কোরাণ না পড়িলেও রফ্‌ত করিয়া লইয়াছে এমনভাবে, যেন মোক্ষম বিদ্যা। উঠিতে বসিতে হাদিস বাতলায়, কোরাণের তফসির মুখে মুখে বলে। হাদিস অনুসারেই প্রকাশ্যে বলিয়াছিল, পরাণ! তোমার মেয়ে সামাল দাও, অমন ধাড়ি মেয়ে বাড়ীর বাইরে যেন না বাহির হয়। কোরাণ হাদিসের খেলাপ গাঁয়ে চলবি না। ...
>
> পরাণ মনে মনে ভাবিয়াছিল: শালা কি চালাক! গোপনে ঘটক পাঠায়, ময়নাকে আমার হাতে দিলে সুখে থাকবে। আর উপরে উপরে চোখ রাঙায়, কোরাণ-হাদিসের ভয় দেখায়। আল্লা কি ওষুধ দিয়েছে পেরধান আর মৌলভীদের হাতে—কোরাণ আর হাদিস, ইসলাম আর মুসলমান। কি না পারে, এই ওষুধের জোরে ওরা দিনকে করে রাত আবার রাতকে দিন, গরীবকে ভয় দেখিয়ে কাবেজ করবার একেবারে ধন্বন্তরী কবচ। (সরদার ২০০৬: ৪৩-৪৪)

আলোচ্য গল্পটির ঘটনাকাল পাকিস্তানি শাসনামল। সমাজে তখন আধিপত্যকামী ধর্মীয় লেবাসধারীদের জয়জয়কার। ফলে এই শ্রেণিরই এক প্রতিনিধি গণি মণ্ডল অনায়াসে পরাণ ও কাজী মাস্টারের ওপর নির্বিচারে অত্যাচারের খড়্গ চালায়, যার আঘাত থেকে রক্ষা পায় না গ্রামের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার্জনের জন্য প্রতিষ্ঠিত স্কুলগৃহটিও।

সরদার জয়েনউদ্‌দীনের অভীষ্ট গণমানুষের মুক্তি। সমস্ত দলন-পীড়নের বিপরীতে দাঁড়িয়ে

টিকে থাকার সামান্যতম অবলম্বনকেও আঁকড়ে ধরেছে তাঁর গল্পের চরিত্ররা। তাই কাজী মাস্টার ওরফে আমানত কাজী নতুন উদ্যমে শুরু করতে চায় পাঠশালা প্রতিষ্ঠার কাজ। তিনি চান, 'লেখাপড়া শিখুক মানুষ, নইলে যে মানুষ বাঁচতে শিখবে না।' তাঁর স্বপ্নসারথী হয়েছে কৃষক পরাণ। গল্পের সমাপ্তিতে 'লাল সূর্যের আলো'র প্রতীকী তাৎপর্যে আভাসিত হয়েছে উজ্জ্বল আগামী—

> কাজী মাষ্টার একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে পরাণের দিকে। হঠাৎ তাহার নজর হইল, পরাণের মাথার উপর দিয়া লাল সূর্যের আলো উঠিতেছে। (সরদার ২০০৬: ৪৮)

'অপণা মাংসে হরিণা বৈরী'—পঙ্‌ক্তিটি *চর্যাপদের*। নিজের শরীরের মাংসের জন্য হরিণ নিজেরই শত্রু। শিকারির সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি সর্বদা তার ওপর। তেমনি নারীর দেহকান্তি তার নিজেরই সর্বনাশের অন্যতম মুখ্য কারণ। শোষক-শিকারিরা তাদের উদ্যত নখরাঘাতে নারীর জীবন ও সৌন্দর্যকে ছিন্নভিন্ন করতে সদাতৎপর। গ্রামীণ পটভূমিতে এ ধরনের একটি বাস্তব সত্যচিত্র অঙ্কন করেছেন সরদার জয়েনউদ্‌দীন তাঁর 'সবজানের সংসার' শীর্ষক গল্পে।

গ্রামের বিত্তবান ও প্রভাবশালী শ্রেণি দরিদ্রকে কেবল পদানত করেই ক্ষান্ত হয় না, তাদের জীবনযাপনের সমুদয় উপকরণও করায়ত্ত করতে চায়। সহজ-সরল নারীলক্ষ্মীদের প্রতিও এই শোষকেরা নিক্ষেপ করে লোভী দৃষ্টি। 'সবজানের সংসার' গল্পে কেতাবদি একজন দরিদ্র দিনমজুর। সে শ্রমকাজ করে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের বাড়িতে। সেই প্রেসিডেন্টের কুনজর পড়ে কেতাবদির স্ত্রী সবজানের ওপর। সবজানের উক্তি—

> বলার মুখ আর নাই আমার। আমি পেসিটনের বাড়ী ধান বানা বন্দ সাধে করি নাই। ... পেসিটন লোকটা ভালো না, নজর খারাপ। আজ পেসিটন বাড়ী বয়া আসে, আমার ইজ্জতের পর জোর করে হাত দিল। ...
>
> রাগে কেতাবদির শরীর গোসাপের মত ফুলতে থাকে। ... ও ভাবে উঃ শালা শুয়াররে, মানুষের জাত না। শালা তোমার পেটে পেটে এত? জাকাত দ্যাও, গরীব দুঃখীর দান খয়রাত কর, হজ করে হাজী হইছো, আর গোপনে সব্বনাশা বদমাইশের চূড়ান্ত। এই জন্যি তোমার কেতাবদি না হলি চলে না। কেতাবদিকে এত ভালোবাসা কেবল তার সব্বনাশের জন্যি। চিরদিন কারো সমান যায় না, কেতাবদি জানে বাঁচে থাকলে তোমায় দেখে নিবি,—তাতে যদি তার সারাজীবন জেলে যায়া পচতি হয়। (সরদার ২০০৬: ৫০-৫১)

কেতাবদির এই স্বগত সংলাপ এক পর্যায়ে পরিণতি পায় বাস্তবে। দেশত্যাগের জন্য বারংবার স্ত্রীর অনুরোধ উপেক্ষা করে সে এর শেষ দেখতে চায়। কিন্তু নিপীড়ক প্রেসিডেন্টের সৃষ্ট ফাঁদে অচিরেই হৃতসর্বস্ব হতে হয় তাকে। গরু চুরির মিথ্যা মামলায় ছয় মাসের দণ্ডপ্রাপ্ত কেতাবদি জেলবন্দি অবস্থায় অনাগত মুক্ত জীবনে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে নতুন দিনের প্রত্যাশায় দিনযাপন করে। অবশেষে শাস্তির মেয়াদ পূর্ণ হলে কালবিলম্ব না করে সে গভীর উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগ নিয়ে রাতে অন্ধকারে ছুটে আসে বাড়ির দিকে। কিন্তু ততদিনে দুর্ভিক্ষের দুর্দিনে সবজান হয়ে পড়েছে প্রেসিডেন্টের ভোগের সামগ্রী। সবজানের ঘুম জড়ানো কণ্ঠস্বরে তাই শোনা যায়, 'কে পেসিটন? এত দেরী হলো ক্যান?' শোষকের কূটচাল এবং বিরূপ সময়ের

অভিঘাতে এভাবেই এই সমাজে কেতাবদিরা হয়ে পড়ে নিঃস্ব, রিক্ত; সবজানেরা হয়ে ওঠে শোষকের কামনা চরিতার্থ করার মোক্ষম উপায়। এই সমাজের চিরচেনা চিত্র হচ্ছে—দারিদ্র্যের কশাঘাত, নির্বিত্তদের ওপর বিত্তবানদের লাগামহীন নিপীড়ন, সামাজিক অবক্ষয় ইত্যাদি। ছোটগল্পের এই আখ্যানের মধ্য দিয়ে গল্পকার হয়ে উঠেছেন বাংলাদেশের পঞ্চাশের দশকের গ্রামীণ সমাজের অন্যতম শক্তিমান কথাকার। সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> জয়েনউদ্দীন যে পল্লী সমাজের ছবি এঁকেছেন সেখানে রয়েছে অসংখ্য নিম্নবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষ। দারিদ্র্য তাদের নিত্য সহচর। সে সমাজে তাদের মাথার উপর মাংসলুব্ধ শকুনের ন্যায় উড়ে বেড়াচ্ছে লম্পট জমিদার, গ্রাম্য মোড়ল, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, ভণ্ড পীর, স্বার্থপর প্রবঞ্চক ব্যবসায়ী, দারোগা পুলিশ ও সম্পন্ন অবস্থার গৃহস্থরা। বেঁচে থাকার শেষ সম্বলটুকু কেড়ে নিতে উদ্যত। এ সমাজে মানবতার নিত্য অপমান। (সুনীলকুমার ১৩৬৭: ৭৫)

ঘরামি থেকে ঢুলী, অতঃপর চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন—'নয়ান ঢুলী' গল্পের মুখ্য চরিত্র নয়ানের এই পেশা পরিবর্তনের সমান্তরালে উন্মোচিত হয়েছে গল্পকারের সচেতন সমাজভাবনা। বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে সংঘটিত মন্বন্তর (১৩৫০ বঙ্গাব্দ) এ ভূখণ্ডবাসীর, বিশেষত গ্রামের নিম্ন আয়ের মানুষের অস্তিত্বসংকটকে করে তুলেছিল সুতীব্র। বছর কয়েকের ব্যবধানে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রে প্রতিকূল জীবন-জীবিকার পাশাপাশি আবহমান সংস্কৃতিও বিপন্ন দশায় নিপতিত হয়। পাকিস্তান সরকারের মদদপুষ্ট সমাজপতিরা নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের প্রয়োজনে বাঙালি সংস্কৃতির প্রাণপ্রবাহকে রুদ্ধ করার জন্য তৈরি করে নানা অজুহাত। এই গল্পে দেখা যায়, দরিদ্র নয়ান ঢোল মেরামত করে জীবিকা উপার্জন করত। কিন্তু অকস্মাৎ সমাজে বইতে শুরু করেছে উলটা স্রোত —

> পীর ও মৌলবী সা'বরা বলেন—গান-বাজনা করা হারাম। তাই ওরা—ছবু কর্মকার, গহের গায়ানী, মেহের বয়াতী সব গান বাজনা ছেড়ে দিয়েছে। না দিয়ে তো উপায় ছিল না। সমাজে একঘরে হয়ে থাকা যায় কতদিন। তাও ওরা জিদ করে ছিল অনেক দিন। বলতো: একঘরে কেন, আরে যা পার তাই কর, আমরা গান বাজনা করবই। সে কথা নিয়ে মেহের বয়াতী ধুয়া বেঁধেছিল—
>
> আমরা কয়জন একঘরে আয়
ঘর বাঁধি এক সাথে ...।
>
> সত্যি ওরা গাজীর গান, ভাসান গান ও জারীর গান নিয়ে রাত দিন মত্ত থাকতো। তারপর দিনকালও যেমন খারাপ হয়ে গেল, সাথে সাথে মানুষের সুখও গেল। পেটে ভাত নাই, পরনে কাপড় নাই—কার গান কে করে। তারপর এখন তো শরিয়ত মোতাবেক চলতে হবে, এখানে গান বাজনার ঠাঁই নাই। তাই ওদের মুখ চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়েছে। (সরদার ২০০৬: ৫৭-৫৮)

দেশভাগ-দুর্ভিক্ষ-কালোবাজারি-চোরাকারবারি এবং সর্বোপরি নষ্ট সমাজের প্রবঞ্চনার শিকার নিম্নবিত্ত শ্রেণি। সঞ্চিত টাকা ঘরে মজুদ রেখে বিত্তবানেরা তাদেরকে বঞ্চিত করে শ্রমের বিনিময়ে প্রাপ্য মজুরির অধিকার থেকে। অনন্যোপায় হয়ে তাই চিকিৎসাহীন অনাহারে-

অর্ধাহারে থাকা স্ত্রী-সন্তানের প্রাণ রক্ষার্থে নয়ান ঢুলী বেছে নেয় চৌর্যবৃত্তির পথ। তার সঙ্গী হয় শীতেল চোর। কিন্তু হারান পরামানিকের বাড়িতে চুরির দায়ে ছয় মাসের কারাভোগের পর ফিরে এসে নিজের স্ত্রী-সন্তানকে জীবিত অবস্থায় পায় না নয়ান। তার মতো সর্বস্বহারারা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য প্রতিনিয়ত লড়াই করে নানা অপশক্তির বিরুদ্ধে, নিয়তির বিরুদ্ধে। তাই নয়ানকে উদ্দেশ্য করে পচাইয়ের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়, 'তুমি আর একবার উঠে দাঁড়াও, নইলে আমরাও বাঁচব না।' ফলত, বেঁচে থাকার তাগিদে নয়ান ও পচাই রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে পড়ে সমাজবিরুদ্ধ পেশায়, চুরির উদ্দেশে:

> বাইরে তখন গহন আঁধার সারা পৃথিবী সারা পৃথিবীকে গ্রাস করে রেখেছে। এত আঁধার যে সে আঁধারের গভীরত্ব ভয় জমিয়ে তোলে মানুষের মনে। তবু ওরা দুজন গায়ে মিশে নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে সে আঁধার ভেদ করে চলে এগিয়ে।
>
> লোকজন জাগোও—মাঝে মাঝে চৌকিদারের হাঁক সে রাতের গভীর নিস্তব্ধতাকে ভেঙ্গে খান খান করে দূর হতে আরো দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। নয়ান আস্তে আস্তে পচাইকে সাহস দিয়ে বলে—ভয় খাস্‌নে পচাই ও গোপাল চোকিদার ঘরে শুয়েই হাঁকছে। (সরদার ২০০৬: ৬২)

দুই

সরদার জয়েনউদ্‌দীনের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ *বীরকণ্ঠীর বিয়ে*। এ গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে বারোটি গল্প—'বাতাসী', 'রঙ্গিলা আসমান', 'বয়াতী', 'ইজ্জত', 'গোলাপীর সংসার', 'কোয়েলা', 'নসিমন', 'কুলটা', 'তালাক', 'জীবন-চক্র', 'উজান-বাঁক', 'বীরকণ্ঠীর বিয়ে'।

'বাতাসী' গল্পে পশুর সঙ্গে মানুষের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের গভীরতা বিধৃত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণীয়, বাংলা সাহিত্যে এ ধরনের গল্প পূর্বেও লেখা হয়েছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'আদরিণী', শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মহেশ', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কামধেনু', কাজী নজরুল ইসলামের 'পদ্ম-গোখরো' প্রভৃতি এ ধারার উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এসব গল্পের তুলনায় জয়েনউদ্‌দীনের 'বাতাসী' শিল্পমূল্যে অনেকটাই দুর্বল। তবে গল্পের অন্ত্যে বাতাসীর (ঘোটকী) মালিক মদিনের ওপর সামন্ত ভূস্বামীর অত্যাচার এবং মদিনের নীরব কান্নার সঙ্গে বাতাসীর কান্নাকে প্রতীকায়িত করে গল্পটিতে চমৎকার দ্যোতনা তৈরি করেছেন গল্পকার:

> বাতাসীর আর্তস্বর না? চিহিঁহিঁ করিয়া বাতাসী কাঁদিতেছে। একি? জমিদার কাছারির পাইক পেয়াদারা বাতাসীকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে বাতাসী চিহিঁহিঁ করিয়া কাঁদিতেছে। নায়েব মহাশয় বলিলেন, তিন বছরের খাজনা দেও না, বাকী খাজনার দায়ে ঘোড়া ক্রোক করা হইল, নীলাম ডাক হইবে। (সরদার ২০০৬: ৭০)

'বয়াতী' গল্পে গ্রামীণ পটভূমিতে আধুনিক চেতনার রূপায়ণই গল্পকারের অন্বিষ্ট। আলোচ্য গল্পের নামকরণ 'বয়াতী' হলেও এখানে বয়াতী মেহের আলী এবং পির বংশজাত মোবারক মীর সমভাবে বর্তমান। এমনকি গল্পের প্রতিপাদ্য বিষয় প্রায়শই নিয়ন্ত্রণ করেছে মোবারক মীর। গ্রামীণ সমাজে তথাকথিত পির-মুর্শিদের কর্তৃত্ব, ক্ষমতা ও পদমর্যাদার প্রতি একধরনের বিরূপতা এই চরিত্রসৃষ্টির মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন গল্পকার। পির-মুর্শিদের বিরুদ্ধে মীর

মোবারকের ভাবনা ও অবস্থান গল্পের কাহিনি ধারায় আনুপূর্বিক অসংগতিপূর্ণ ও প্রক্ষিপ্ত মনে হলেও গল্পকারের গ্রামীণ সমাজ সম্পর্কিত একটি বিশেষ দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হয় পাঠক। এতৎপ্রসঙ্গে বয়াতী মেহের আলীকে লক্ষ করে পির-মুর্শিদ সম্বন্ধে মোবারকের অভিমত লক্ষণীয়:

> ১. গায়ের আলখেল্লা আর মাথার টুপি এছাড়া ভিতরে সব ফাঁপারে ফাঁপা। পেটে বোমা মারলে দোওয়া গঞ্জেল আরশ বেরয় না। যত সব ফক্কি ফারাজী। সাধে তোরে বলি, সেই কাজটা করে এই ব্যাটাদের বুজুরকী সব ফাঁক করে দে। যে টুকু আছে তাও যাক। (সরদার ২০০৬: ৭৮)
>
> ২. এই চৌদ্দ পুরুষের পীর মুর্শিদি এটা যে একেবারে সেরেফ ফাঁকিবাজী তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিবে কিন্তু। (সরদার ২০০৬: ৭৯)

এ গল্পে গ্রামীণ সমাজে গেঁড়ে বসা ভণ্ড পিরপ্রথার বিরুদ্ধে সরদার জয়েনউদ্‌দীনের অবস্থান অত্যন্ত সরব।

'গোলাপীর সংসার' ও 'কোয়েলা'—গল্প দুটি একসঙ্গে বিচার্য। মূলত এ দুটি গল্প একটি কাহিনিরই ধারাবাহিক বিন্যাস। গ্রামীণ পটভূমিতে সমাজশৃঙ্খলে নিষ্পেষিত এবং ধর্ষিতা মা-মেয়ের অসহায় নারীজীবনের যন্ত্রণাবিদ্ধ আলেখ্য এ দুটি গল্প। 'শক্তির দাপটে পুরুষ তার নিজের মতো করে গড়ে তোলে সমাজ। কাজেই পুরুষ কমজোর নারীর ইজ্জতের উপর হামলা করে। তার প্রতি সে হয় অন্যায়ভাবে নির্দয় ও নির্মম' (আজহার ২০১৪: ১৫৯)। গোলাপী এবং তার গর্ভজাত কন্যা কোয়েলা সমাজের এই পাশবিকতার শিকার। অসুস্থ স্বামী নিজামতকে নিয়ে অভাব-অনটনের সংসারে গোলাপীর সংগ্রামী জীবনের কথকতা প্রথম গল্পটি। আহার্য সংগ্রহের প্রয়োজনে অসুস্থ স্বামীকে বাড়িতে রেখে ঝি-গিরি করতে গোলাপীকে যেতে হয় তালুকদার ডাক্তারদের বাড়ি। ফলে একদিকে দুশ্চরিত্রার তকমা দিয়ে সমাজ তাকে পতিত করে, অন্যদিকে সমাজকর্তারা তাদের কামুকবৃত্তি চরিতার্থের উপায় রূপে ব্যবহার করে তাকে। প্রথম যৌবনে সরকার বাড়ির ছেলে মুনসুর পণ্ডিতের সঙ্গে তার প্রণয় সম্পর্ক রচিত হলেও ক্ষমতা ও আভিজাত্যের দাপটে ব্যর্থতাই হয়ে ওঠে তার বিধিলিপি। গোলাপীর ভাবনা-জগতে মাঝে মাঝে জাগ্রত হয়ে ওঠে সেই বিষাদময় স্মৃতি:

> মুনসুর সরকারের বাবা হাজী ছেরামত সরকার দশগাঁর ডাকসাইটে প্রধান। পয়জার মেরেছিল গোলাপীকে আর তার মাকে। শেষে বংশের ইজ্জত বাঁচাতে কোথা থেকে নিজামতকে ধরে এনে গোলাপীর মুখ দিয়ে উচ্চারণ করিয়ে নিয়েছিল, কবুল। গোলাপী সমাজের হাদিসে গড়া-ইচ্ছার ভেলায় ভাসিয়ে দিয়েছিল তার মনকে অনেক কষ্টে। (সরদার ২০০৬: ৯১)

উক্ত ঘটনার মাধ্যমে বৈষম্যময় সমাজের করুণ চিত্রই প্রকটিত করে তুলেছেন গল্পকার। এই সমাজ মানবিক অনুভূতিশূন্য। সমাজবাস্তবতার নির্মম শিকার গোলাপী তাই তার কন্যা কোয়েলাকে কেন্দ্র করে সুন্দর আগামীর স্বপ্ন দেখলেও অবচেতনে বহন করে ঘৃণামিশ্রিত ভয় ও শঙ্কা। গোলাপীর অবচেতন মন থেকে উঠে-আসা ভাবনা-প্রবাহ লক্ষণীয়:

> তুই বড় হয়ে মানুষ হোস, পড়ালেখা শিখিস কোয়েলা, মায়ের মত অমানুষ হসনে। জেবনে বাঁচার মতন বাঁচতি শিখিস। লেখাপড়ার কথা স্মরণ হতে তার আশা আকাঙ্ক্ষা সব যেন মুহূর্তে বুদ্বুদের মত মিলিয়ে যায়। সমাজ পতিতা গোলাপীর মেয়েকে তো কেউ পাঠশালায় পড়তে দিবে না। হৃদয়টা টন টন করে উঠে, জীবনভর কার পাপে এ দারুণ মিথ্যার বোঝা বয়ে গেলাম। অকূল সমুদ্রে হাতড়িয়ে কুল পায় গোলাপী, পণ্ডিতকে হাতেপায়ে ধরে বলবো পণ্ডিত, একদিন আমায় যা দিতে চেয়েছিলে কোরান ছুঁয়ে কসম খেয়েছিলে তার কিছুটা অন্তত দেও। আমার কোয়েলাকে পড়িয়ে লিখিয়ে মানুষ কর। কিন্তু সমাজ, সমাজের কথা মনে হতেই সরকার যেন পান চাবানো ফোকলা মুখে হা হা করে হেসে সামনে এসে দাঁড়ায়। গোলাপী, তুই আমার হ, তোকে আমি মক্কায় নিয়ে হজ করিয়ে আনবো। তারপর তুই হাজিনী গোলাপী, তুই হাজিনী। সব গোনা ধুয়ে ভেস্তে যাবি। (সরদার ২০০৬: ৯২)

'গোলাপীর সংসার' গল্পের পরবর্তী এপিসোড 'কোয়েলা'। এ পর্বে সমাজপতিদের বংশানুক্রমিক শোষণ ও নিপীড়নের পরিপ্রেক্ষিতে গোলাপী-কন্যা কোয়েলার দ্রোহী সত্তাকে প্রকটিত করেছেন গল্পকার। মা গোলাপীর মতো তার ওপরেও পড়েছে সমাজপতিদের লালসাপূর্ণ দৃষ্টি। কিন্তু কোয়েলাকে নিয়ন্ত্রণের সাধ্য তাদের নেই। এমতাবস্থায় গ্রামপ্রধানের ষড়যন্ত্রের শিকার হয় সে। রাখাল করিমের সঙ্গে দ্বন্দ্বের সূত্রে গ্রামপ্রধানের নির্দেশে কতিপয় বখাটে ছেলে তাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। ফলে সমাজে সে পরিচিতি পায় 'পতিতা' ও 'জাতিভ্রষ্টা' রূপে। কিন্তু কোয়েলার পরাজয়ের সংবাদেই গল্পটি শেষ করেননি জয়েনউদ্‌দীন। তিনি ভিনগাঁয়ের 'বিদেশী মাস্টার' চরিত্রের মধ্য দিয়ে স্বীয় ইতিবাচক সামাজিক বোধকেই ব্যক্ত করেছেন গল্পে। এই মাস্টার ইতিহাসের চাঁদ সুলতানার মতো কোয়েলাকে আত্মমর্যাদাবোধে সচেতন করে তুলেছেন, এবং মাতবরের নিকট চূড়ান্ত অপদস্থ হওয়ার মুহূর্তে তাকে জীবনসঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। গল্পে মাস্টারের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সমাজব্যবস্থার বিবর্তমান চিত্রই হয়েছে বাঙ্ময়:

> এ অত্যাচারও একদিন শেষ হবে, এই ভাঙ্গার ভিতর দিয়েই একদিন নূতন সমাজ গড়ে উঠবে। মাষ্টারের প্রতিটি কথা কোয়েলার মনে এক নূতন দুনিয়ার, নূতন সমাজের খবর এনে দিল। সে সমাজের ধ্বংস সেই, যে সমাজে জুলুম নেই, অশান্তি নেই। (সরদার ২০০৬: ৯৮)

এরই মধ্য দিয়ে মানবতাবাদী এই শিল্পী গ্রামবাংলার সামাজিক বাস্তবতার চালচিত্র রূপায়ণের সঙ্গে অঙ্কন করেছেন এক শোষণহীন, বঞ্চনাহীন সমাজের কাঙ্ক্ষিত চিত্র।

'নসিমন' গল্পটিও গ্রামীণ সমাজপটে ধৃত যন্ত্রণা-জর্জর নারীজীবনের শিল্পভাষ্য। গল্পটিতে বর্ণিত হয়েছে পল্লির দরিদ্র কন্যা নসিমনের নয়নতারা হয়ে ওঠার ইতিবৃত্ত। মাতৃহারা নসিমন সৎ মায়ের স্নেহস্পর্শধন্য হলেও 'চাকুরে জামাই' রাজার সঙ্গে তার বিয়ের স্বপ্ন অধরাই থেকে যায়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বরপক্ষের নানা চাহিদার কাছে বলি হয় নসিমনের জীবন। একপর্যায়ে পিতার আদেশে বাধ্য হয়ে অধিক বয়সী 'কারখানার মিস্ত্রী ছমির মিয়ার ঘর করতেই শেষ পর্যন্ত নসিমন'কে যেতে হয়। কিন্তু বেশিদিন স্থায়ী হয়নি তার বৈবাহিক জীবন। পরবর্তী ঘটনাধারা তাকে নিক্ষেপ করেছে এক কঠিন জীবনাবর্তে। প্রেমিক রাজার প্রলোভনে সুখের আশায় স্বামীর ঘর ছেড়েছে নসিমন:

> তারপর কি দারুণ আঘাতে তার কপাল ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। লজ্জা সরমে ফিরে যেতে পারে নাই স্বামীর ভিটায়। এদিকে রাজার বাবা এমনকি তার নিজের বাবাও স্থান দেয়নি তাকে—কুলখাকী মেয়েকে। ঢিঢি পড়ে গিয়েছিল। কলংকের কালিতে চাপা পড়েছিল তার মুখ। সমাজ তাই তাকে ঝাঁটা মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিল। বাবার কড়া শাসন রাজাকে করেছিল বন্দী, তাই রাজাও তাকে স্থান দিতে পারেনি। (সরদার ২০০৬: ১০৫)

সমাজের অপবিধানে ওষ্ঠাগতপ্রাণ নসিমনের শেষ অবধি ঠাঁই হয় রেল কলোনির ওপাশের পাড়ায়; পতিতা-পল্লিতে। গ্রামীণ সমাজে বেড়ে ওঠা এক সাধারণ মেয়ে নসিমন এভাবেই হয়ে ওঠে বারবনিতা নয়নতারা। সমাজের একচক্ষু-নীতির বলি হয় সে। সমাজ তাকে দাঁড় করিয়ে দেয় পতিতা-পল্লির রাজুবালা, সৌদামিনী ও নীরদাদের কাতারে।

'কুলটা' গল্পটিতেও সরদার জয়েনউদ্‌দীনের সম-সমাজভাবনার প্রতিফলন লক্ষণীয়। গল্পের নায়িকা ময়নার মা ওরফে চাঁপা যখন সন্তানসম্ভবা, তখন মৃত্যুবরণ করে তার স্বামী ছিরামদি। ফলে হিসাব-নিকাশের গোলকধাঁধায় সমাজের কাছে হার মানতে বাধ্য হয় সে। সমাজও তাকে ব্যভিচারিণী আখ্যায়িত করে নামিয়ে দেয় রাস্তায়। অতঃপর কুলবধূ চাঁপা হয়ে যায় কুলটা। সমাজ-দানবের ইচ্ছাই শেষাবধি জয়ী হয়। গল্পকার জানিয়েছেন:

> তারপর হিসেব মিলিয়ে সকলে যা অঙ্ক মিলিয়েছিল তা চাঁপার পক্ষে মোটেই সুখের হয়নি। সে হিসেবের অঙ্কেও কড়া কড়া দাগ—চাঁপার পিঠের উপর হালের নড়ি দিয়ে লিখেছিল চাঁপার দেওর মেনাজদ্দি; শুধু এইই নয়, চাঁপাকে চুল ধরে বাড়ী থেকে হেঁচড়ে টেনে বের করে দিয়ে বলেছিল: কুল যখন খাইছিস্ তখন আর ঘরে তোর জাগা নাই, যা—বাজারে যা। (সরদার ২০০৬: ১১০)

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরবর্তী পর্যায়ে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি শুরু করে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের এক শ্রেণির মানুষ। ধর্মের নামে তারা গোঁড়ামি, ভণ্ডামি ও কুসংস্কারকে পুঁজি করে অবতীর্ণ হয় আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করার প্রতিযোগিতায়। ধর্মের নামে অধর্মাচারের এ বাস্তব চিত্রই প্রতিফলিত হয়েছে 'তালাক' গল্পে। নামকরণের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে গল্পটির মৌল বিষয়বস্তু। আরবি শিখতে গিয়ে হাশেম মৌলবির লালসার শিকার হয় তেরো বছর বয়সী কিশোরী নূরজাহান। সমাজে মুখরক্ষার বলি সন্তানসম্ভবা নূরজাহান তেরো থেকে পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত মৌলবির তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীরূপে প্রতিবছর সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে ভোগ করে দুঃসহ জীবনযন্ত্রণা। তদুপরি 'গায়ের রক্ত সব চুষে শুকায়। তাও যদি ওষুধ পত্তর দেওয়া যেত, সময় মত দুটো খাবার খেতো, তা হলেও কথা ছিল। প্রায়ই নিরম্বু উপবাস, ওষুধের নামে দোওয়া, তাবিজ, বড় জোর গোপাল ওঝার টোটকা, নয়তো পীর সাহেবের ফুঁ ফাঁ' (সরদার ২০০৬: ১১২)। এমতাবস্থায় ক্ষুব্ধ নূরজাহান রাগে-দুঃখে ফেটে পড়ে স্বামীর বিরুদ্ধে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচিত *লালসালু*তে ধর্মব্যবসায়ী মজিদ যেমন নিজের মনগড়া ধর্মীয় ব্যাখ্যা তৈরি করে রহিমা ও জমিলাকে নানা ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে নিজের কর্তৃত্ব বহাল রাখতে প্রয়াস পায়, এ গল্পের হাশেম মৌলবির মধ্যেও লক্ষ করা যায় একই ধরনের প্রবণতা। *লালসালু* প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালে। জয়েনউদ্‌দীন 'তালাক' গল্পটি লিখেছেন ১৯৫৫ সালে। দুটি সাহিত্যকর্মেই শরিয়তি আইনকানুনের দোহাই দিয়ে একটি

গোষ্ঠী গ্রামের অক্ষরজ্ঞানহীন দরিদ্র মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সদাব্যস্ত। *লালসালু*তে এসব বকধার্মিকদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য প্রতিবাদ দেখাননি ওয়ালীউল্লাহ্; মূলত রূপক-প্রতীকের আবরণে ঘটেছে তার বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু আলোচ্য গল্পটি যে সময়ে রচিত, সে সময়ে এই ভূখণ্ডে ইতোমধ্যে সংঘটিত হয়ে গেছে ভাষা-আন্দোলনসহ বাঙালির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার নানা সংগ্রাম। এ দেশের গ্রামাঞ্চলেও পৌঁছে গেছে তার রেশ। আধুনিক যুগের নানা আইনকানুন সম্পর্কেও মানুষ ক্রমশ সজাগ হতে শুরু করেছে। ফলে সমাজশৃঙ্খলে তাকে আটকে রাখাও হয়ে উঠছে দুরূহ। সেই নতুন কালের মানুষের প্রতিনিধি এ গল্পের নূরজাহান। আর 'তালাক' যেন এখানে নারীর আত্মজাগরণের দীপ্র আকাঙ্ক্ষার শৈল্পিক প্রতিভাস। তাই পরকালের নানা ভয়-ভীতি প্রদর্শন করলেও স্বামী প্রদত্ত মাদুলি ও পানিপড়ায় আস্থা নেই নূরজাহানের। শরীফপুরের বোস ডাক্তারের কাছে বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক চিকিৎসা করতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সে। শৈশবের বান্ধবী বাসন্তীর সাহসী সংস্পর্শে এবং সর্বোপরি স্বীয় জীবনের বেদনাবিধুর পরিণতি লক্ষ করে তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতামূলক সংলাপ। অন্তর্বেদনামথিত আত্মোপলব্ধিতে নূরজাহান বলেছে:

> আখেরাতে স্বামীর সুপারেশ ছাড়া চলবে না? না চলে না চলুক। এ জীবনটা যার স্বামীর জন্যে পয়মাল হয়ে গেল তার আবার আখেরাত কি? মুখে আগুন ওরকম স্বামীর। ... আব্বাজান বলেছিলেন, নুরী-মা মেয়েদের বাংলা বেশী পড়ে লাভটা কি? চিঠিখানা লিখতে শিখলেই তো হলো। আরবী পড়ো, আখেরাতের কামে লাগবে।
>
> তখন যদি সে ঘুণাক্ষরেও জানতে পারতো আরবী পড়তে গিয়ে আখেরাতটা এমন ঝরঝরে ফর্সা হয়ে যাবে যে, সারাজীবন ভর তার সেই গোনাগারীর বোঝা বেসামাল হয়ে বইতে হবে, তবে কি আর সে এই ফাঁদে পা দিত? (সরদার ২০০৬: ১১৩)

স্বামীসৃষ্ট সমস্ত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও সে তার সিদ্ধান্তে শেষ পর্যন্ত থাকে স্থিরপ্রতিজ্ঞ—'তপ্ত মাটিতে পা বাড়িয়ে দিয়ে বললো, তাই হোক মুরোদ থাকে কেটেই ফেলাও, আমি যাবই' (সরদার ২০০৬: ১১৫)। ক্রোধান্ধ মৌলবি স্বামী অগত্যা তার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মোক্ষম অস্ত্র—তালাক! কিন্তু দমে যায়নি নূরজাহান; ক্রন্দনরত অবস্থায় তার কণ্ঠে ব্যক্ত হয়েছে দীর্ঘদিনের যন্ত্রণা নিরসনের প্রশান্তিময় উচ্চারণ—'হাজার শুকুর'। ধর্মের অপবিধান-কবলিত সমাজের সমস্ত ভয়-ভীতিকে উপেক্ষা করে ঋজুভঙ্গিতে এভাবেই প্রতিবাদ করেছে নূরজাহান।

তিন

সরদার জয়েনউদ্‌দীনের তৃতীয় গল্পগ্রন্থ *খরস্রোত*। এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে এগারোটি গল্প। গল্পগুলি হচ্ছে—'উপকথা', 'পাষাণ', 'কসম', 'মাটি', 'খরস্রোত', 'ইতিহাসের ছেঁড়াপাতা', 'কুকুর', 'দ্রৌপদী', 'সামাজিক', 'বকসো আলী পণ্ডিত', 'আলীজান'।

বৃদ্ধ ওসমান খাঁর মনোজাগতিক স্মৃতির সূত্র ধরে 'উপকথা' গল্পে বর্ণিত হয়েছে সমকালীন সামন্ত শ্রেণির অত্যাচারের কাহিনি। ঢোলের শব্দ শোনার মধ্য দিয়ে তার অন্তর্প্রদেশে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে পঞ্চাশ-ষাট বছর পূর্বেকার দুঃসহ স্মৃতিবিজড়িত এক ঘটনা। সে সময় বিশ-বাইশ

বছরের তেজোদ্দীপ্ত ওসমান খাঁ চৌধুরী-পরিবারের বিরুদ্ধে গড়ে তুলেছিল সমবেত প্রতিরোধ। কিন্তু তাতেও সামন্তশক্তির প্রতিভূ চৌধুরীরা দমে যায়নি। কালের পরিক্রমায় দুলাই পরগণায় পুনর্বার সূচিত হয়েছে সামন্ত প্রভুদের দৌরাত্ম্যের আরেক অধ্যায়। জমিদার-ভূস্বামীদের অত্যাচার ও শাসন-শোষণের প্রকটতাকে সরদার জয়েনউদ্‌দীন এ গল্পে উপস্থাপন করেছেন বৃদ্ধ ওসমান খাঁর স্মৃতিমন্থন-প্রসঙ্গে:

> ব্যাধের শর খেয়ে যেমন বিহঙ্গ ছটফটায়, ওসমান খাঁর মনটা তেমনি ছটফট করে মরতে লাগলো। আবার নতুন জমিদার! আবার বুঝি শোষণ আর শাসন, হত্যা আর ইজ্জত লুণ্ঠন। (সরদার ২০০৬: ১৩৬)

সরদার জয়েনউদ্‌দীন তাঁর ছোটগল্পে চিত্রিত করেছেন স্বকালের সামাজিক অসামঞ্জস্য, নিপীড়ন, অন্যায়, অবিচার ও অসংগতি। ইতিবাচক জীবনবোধে আস্থাশীল এই কথাকারের অভিপ্রায় একটি শোষণমুক্ত সুশৃঙ্খল সমাজ। সতর্ক সমাজবোদ্ধা হিসেবে তিনি অবহিত ছিলেন যে, নিম্নবিত্ত শ্রেণির প্রতিবাদ-প্রতিরোধ আইনের মারপ্যাঁচ এবং ষড়যন্ত্রের সাহায্যে ক্ষণিকেই নসাৎ করে দিতে পারে সমাজপতিরা। 'কসম' গল্পে এ ধরনের বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটেছে। গল্পের প্রারম্ভ পটভূমি নগরজীবন। ঢাকার সদরঘাটে এক খোঁড়া ভিক্ষাজীবী ব্যক্তির কাতরোক্তিতে উন্মোচিত হয়েছে গল্পের আখ্যানবস্তু। সামান্য খোরমুজ চুরির মিথ্যা দায় চাপিয়ে দোকানদারের উস্কানিতে তাকে বেদম প্রহার করে উপস্থিত জনতা। কিন্তু সে কোনো ভিক্ষুক নয়, সে সদু মণ্ডল, একজন জাতকৃষক। গল্পকারের ভাষায়, 'চোর জুয়াচোর নয়, এ ওর কপালের ফের আর সর্বনেশে একজাত মানুষের জুলুমের ফল।' গ্রামের সাধারণ কৃষক সদু মণ্ডল, সদন প্রামাণিক এবং আরো অনেক কৃষকের জীবনে নেমে এসেছে চরম দুর্দশা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, কালোবাজারি-মজুতদারি, পঞ্চাশের মন্বন্তর, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের স্বেচ্ছাচারিতা প্রভৃতির ফলে তাদের অস্তিত্ব সংকট পৌঁছেছে চরমে। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের শাসন ও শোষণে নিজের জমিতেই কৃষকদের তৈরি হয়েছে অধিকারহীনতা। সদু মণ্ডল ও সদন প্রামাণিকের কথোপকথনে অনাচারের ধরন উঠে এসেছে এভাবে:

> রোজ রোজ ঐ গাই ছাড়ে দেওয়া চাই-ই ... সদন প্রামাণিক কহিল, তাড়ায়া কি করবে মণ্ডল ও পেসিটোনের গাই, আবার ঘুরে আসবিনি, খোয়াড়ে দেওয়া মানা। দিছলো তোমেজ কানা, বুঝে নিল—মাসের কয়দিন যায়, বেটার ভিটেয় ডাকালো ঘুঘু, দিল এক ঠেলায় জেলের ঘানিতে জুড়ে—চুরির কেসে ফাসায়া। বোঝগে বেটা গাই খোয়াড়ে দেওয়ার রামঝালটা। বসন্তে গিছলো এক চোখ—আর একটা চোখ ছিল, সেটা বুঝি মাগ ছাওয়ালের শোকে জেলের মধ্যে কাঁদে কাঁদে আঁধা হয়। (সরদার ২০০৬: ১৪৮)

কঠোর পরিশ্রমের পর যে ফসল উৎপাদিত হয়, তা থেকে কৃষকদেরই বঞ্চিত করা হয় নিষ্ঠুর উপায়ে। তাদের উৎপাদিত ধানের অধিকার থেকেও তারা বঞ্চিত। এ অবস্থায় শস্য-উৎপাদনকারীর কাছে ভাত খাওয়া যেন 'স্বপন' বা 'পরমান্নসম'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজে নতুন করে গজিয়ে ওঠা স্বার্থান্ধ শ্রেণি শ্রমজীবী কৃষকদের কাছ থেকে হরণ করে নিয়েছে ভাত খাবার অধিকার; লুণ্ঠন করে নিয়েছে নারী-লক্ষ্মীদের। সদন প্রামাণিকের জবানিতে উঠে এসেছে সমকালীন জীবনবাস্তবতার সেই করুণ প্রতিচ্ছবি:

> দ্যাশের নাকি ভারি বেপদ, চারদিক নাকি নড়াই, মেলেটারীর নোকের খাবার পাঠাতি হবি। মেলেটারীর তরফতে কনডাকটর আইচে, মালামাল দেশের সাপটে নিতি হবি, না হলি রাজার রাজ্যি থাহে না। ... শুধু কি খাওয়ার, শুনচো কথা, সে জাত জাতান্ত। শোনলাম মেয়ে মানুষ তক দেওয়া হতেছে, ফোঁসলায়া ফাঁসলায়া নিয়ে। (সরদার ২০০৬: ১৪৯)

সমাজপতিরা নিজেদের স্বার্থোদ্ধারে সাধারণ মানুষকে কাজে লাগিয়ে অতঃপর নিক্ষেপ করে আস্তাকুঁড়ে। একদা জমিদারের পক্ষে গঞ্জ দখলের লড়াইয়ে খুন হয় সদন প্রামাণিকের দাদাজান। অথচ সেই জমিদারই আজ তাদের উচ্ছেদকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ। সদন প্রামাণিক তাই আক্ষেপ করে বলেছে:

> ঐ জমিদারের জন্য কি না করছি আমরা। দাদাজান খুন ঐ গঞ্জ দখলে। আমার দিতি হবি তোলা-ট্যাকসো, উপেকার আর কার বলে। বড় ছাওয়ালডার কয়দিন জ্বর ওষুধ আনতি গিছলো দেয় নাই ডাক্তার; বলছে নায়েব বাবুর মানা, যা ওষুধ পাবিনে। (সরদার ২০০৬: ১৫০)

শোষণের জাঁতাকলে পিষ্ট হতে হতে শোষিতরা নিজেদের পরিণতি সম্পর্কে একসময় হয়ে ওঠে সজাগ। দেশের কয় ঘর 'বড় নোক বাবু নোক'ই যে তাদের সর্বনাশের মূলে, তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় তারা। এছাড়া তারা বোঝে, 'বে-ইমানী আর জুলুমী দেশটা ছায়া গেল, গরীব-গারাব আর বাঁচবিনে।' তাই সংঘবদ্ধ ও সংহত প্রতিবাদের মাধ্যমে তারা রুখে দিতে চায় সকল অনাচার। তারা অনুধাবন করে এর 'একটা বিহিত করা দরকার।' এই পরিপ্রেক্ষিতে মাণিক, জটা, ফেলু—গ্রামের এসব হতদরিদ্র পরিবারের সন্তান, যাদেরকে পূর্বেই সমাজপতিরা নানা অজুহাতে দণ্ড প্রদান করেছিল, তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে অতঃপর ঐক্যের ডাক দিয়েছে সদু মণ্ডল:

> ছোলা, মশুর, কলাই, দ্যাশথে উজেড় করে চালান দিল কনডাকটর, আর বাবু ভদ্দর নোক তার দালাল, জমিদার তার সাহায্যি করে। খুব সইছি, আর না মাণিক! আর না। সব গাঁয়ের নোক আজ কমিটি বাঁধো, ধান কলই আজ কর্জ দেও, শোধ দেব আশ্বিন কাত্তিকে। নয়তো লুট করবো। আর ভিন দেশী লোকের কাছে সব বেচা কেনা বন্দ, যা থাকে অদেষ্টে। (সরদার ২০০৬: ১৫৩)

গ্রামীণ সমাজে এভাবেই অত্যাচারের শিকার হতে হতে একপর্যায়ে শোষিতরা উজ্জীবিত হয়ে ওঠে প্রতিবাদী স্পৃহায়।

পদ্মার বুকে জেগে ওঠা চর দখলের লড়াইয়ের গল্প 'মাটি'। পদ্মার ভাঙনে বিলীন হয়ে যাওয়া চরের জমি ফিরে পাওয়ার উদগ্র প্রত্যাশায় সময় কাটে ষাটোর্ধ্ব বৃদ্ধ কালে খাঁর। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর পূর্বে এই সোনার চরে উৎপন্ন হতো নানান ফসল। সে সময় 'চরের লোকের ফুর্তি কি! গায় তেল চুয়ায়া পড়ত। যেমন ছিল এক এক জনের শরীল তেমন পরাণডা। গাঁয়ে কেউ না খায়া থাকত না' (সরদার ২০০৬: ১৫৫)। সেই সুদিনের প্রতীক্ষায় এখনও প্রহর গণনা করে কালে খাঁ। পদ্মার গহীন তলদেশে দৃষ্টি ফেলে বারংবার পরখ করে বলে, 'খাঁপুরার চরের মাটি কতদূর, কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস রাক্ষুসী, সে সোনা?' (সরদার ২০০৬: ১৫৫)। সোনালি অতীতের কথা স্মরণ করে স্মৃতির জগতে বিচরণ করতে থাকে বৃদ্ধ। একটি চিত্রকল্পাত্মক বর্ণনাংশের মাধ্যমে এ প্রসঙ্গ ব্যঞ্জনাময় রূপ লাভ করেছে গল্পকারের ভাষায়:

> অধিক রাত তক নৌকার উপরে বসে বসে জীবনের ছেঁড়া কাঁথা সেলাই করে, পথের কাদা পানি ভেঙ্গে যখন বাড়ীতে পৌঁছতো, তখন রাত প্রায় অর্ধেক হয়ে যেত কালে খাঁর। (সরদার ২০০৬: ১৫৬)

কিন্তু সরকারি নোটিশের আদেশবলে এই বৃদ্ধসহ এতদঞ্চলের প্রজাদের ঘটেছে স্বপ্নভঙ্গ। কালেকটর অফিস থেকে প্রেরিত নোটিশ প্রাপ্ত হয়ে হাজির হয়েছে আফসার মুন্সি। কিন্তু কালে খাঁর স্পষ্ট জবাব:

> লুটিশ, কিসির লুটিশ? এ শালার বে-আইনী লুটিশ লেহেই বা কোন শালা, আর মানেই বা কোন শালা গাধা। সাহেবেরে কয়ো, কাগজের পাঁজা যিন উল্টেয়ে দেহে, ১৩২৭ সালে কমিশনারের রেমিশন রেপোর্ট আছে, যার জমিন সে পাবি, বালু দুই আনা, নাল আট আনা, পাঁচ বছরের বাকী খাজনা সিকস্থি হওয়ার বছরে রাজ কাচারীতে জমা দিতি হবি। নামুক সরে জমিনি আমিন, কানুনগু আর পাইক প্যায়দা ডিমারকেশনে জমি বুঝে দিক। পাওনা গণ্ডা হিসেব করে নিক। ইয়ের আবার লুটিশ কিসির? (সরদার ২০০৬: ১৫৭-১৫৮)

সরকারি কানুনগো, আমিন, পাইক, পিয়ন প্রভৃতির দৌরাত্ম্যে দুর্বিষহ হয়ে ওঠে পদ্মাপারের জনজীবন। জনতার আপত্তি ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও আজিজ কানুনগোর নেতৃত্বে দূরদেশি ‘বাঙাল’দের মধ্যে নিলাম করে দেওয়া হয় জেগে ওঠা চরের সমস্ত জমি। সদরে গিয়ে কানুনগো, খাসমহল অফিসার এবং সর্বশেষ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট সকাতর প্রার্থনাসহ উপস্থিত হয়েছে এই জনপদের অধিবাসী। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয়নি। এ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্নভঙ্গের ব্যর্থতায় বয়সের ভারে ন্যূব্জ কালে খাঁ মানসিকভাবে হয়ে পড়ে বিষণ্ন। রাতের অন্ধকারে নানা ভাবনা গ্রাস করে তাকে। পিতৃমাতৃহারা নাতনি ফতেজানের বিবাহ সম্পর্কিত চিন্তার সূত্র ধরে অবচেতনে এক বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর হয়ে ওঠে কালে খাঁ:

> শ্রান্ত পদ্মা কুল কুল করে ধীরে বয়ে যাচ্ছে। হাজার মানুষে মিলে মিশে বোঝায় বোঝায় সোনালী ধান কেটে কেটে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ‘নেও যার যা পেরায়জন ক্ষেতের ধানে ডোল ভর। সব মানষির অভাব সমান, যা পাও ভাগ করে খাও?’ ... যত জমিন আছে ছোটয় বড় সমান ভাগে খাও। ... নেচে পিচে ভাইসব। আর দুনেয় শত্তুরতা নাই, ছোট বড় নাই, শান্তি! শান্তি। (সরদার ২০০৬: ১৬০)

উল্লিখিত বক্তব্য যেন গল্পকারের সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার প্রতি সুপ্ত আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। সরদার জয়েনউদ্‌দীন এ ক্ষেত্রে মার্কসীয় সাম্যবাদী সমাজচিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন বলে অনুমিত হয়। তিনি জ্ঞাতসারে জানতেন, বর্তমানে দাঁড়িয়ে কালে খাঁর মতো বয়োবৃদ্ধের দ্বারা এই চিন্তার বাস্তবায়ন কল্পনাতীত। তাই এ ধরনের ইউটোপিয়া বা কল্পসমাজ বিনির্মাণের অক্ষমতাকেও রূপক প্রতীকের মাধ্যমে চিহ্নিত করেছেন গল্পকার:

> কেরোসিনের ডিবিটার সে টিপটিপ আলোটুকুও এখন আর অবশিষ্ট নেই। শেষ তেলটুকুও কখন যেন নিঃশেষ হয়ে ডিবিটার পরমায়ু ফুরিয়ে গেছে। (সরদার ২০০৬: ১৬১)

কেরোসিনের ডিবি যেন হয়ে উঠেছে ক্লান্ত-ধ্বস্ত কালে খাঁর প্রতিরূপক।

সময়ের অভিঘাতে মানুষের ব্যক্তিক ও সামাজিক জীবনের সামূহিক শূন্যতার গল্প ‘ইতিহাসের ছেঁড়াপাতা’। এ গল্পের নিত্যানন্দ মুখার্জী ওরফে নিতাই তার নামের মতোই সর্বদা আনন্দোজ্জ্বল এক চরিত্র। কালীপূজা, স্নান-যাত্রা, দুর্গাপূজা প্রভৃতি উৎসবে কমিক পাঠের মাধ্যমে মানুষকে সে আমোদিত করে রাখে হাসি আর আনন্দে। কিন্তু তার এ হাসির লয় ঘটে প্রথমত, তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ এবং দ্বিতীয়ত, ছেচল্লিশের দাঙ্গা প্রভৃতি মানবসৃষ্ট নানা দুর্যোগ-দুর্বিপাকে। দুর্ভিক্ষের কালে গ্রামের নিরন্ন মানুষ লঙ্গরখানায় দুমুঠো ভাতের আশায় ছুটে গেছে শহরে। যারা গ্রামে থেকে যায়, সরকারি সহায়তা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে গ্রামের স্বার্থান্ধ কাজেম হাজী ও প্রেসিডেন্ট খেরু সোম; থানার দারোগাও এ ক্ষেত্রে তাদের অন্যতম সহযোগী। মনুষ্যসৃষ্ট এ বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে এই সুবিধাবাদী শ্রেণি দুর্ভিক্ষকে দায়ী করে। কিন্তু নিতাই তা মানতে নারাজ; এই দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ ধরা পড়ে তার সংলাপে:

> জন্মা নেই, গোটা পৃথিবীটাতেই কি জন্মা নেই? ধান চাউল নেই তো ‘বেলাকে’ মাল আসে কোথা থেকে? যারা গরীব তাদের বেলায় নেই; বড়লোকের খুব জোটে। এটা আমরা বুঝতে পারি—এই অভাব-অভিযোগ সৃষ্টি ক’রে বড়লোকের দু’টো পয়সা করা—আর গরীব কয়জন মানুষ মারা, এই ত’। (সরদার ২০০৬: ১৬৭)

মন্বন্তরের প্রভাব ক্রমশ ম্রিয়মাণ হতে শুরু করলে মানুষ আবার ফিরে আসতে চায় জীবনের মূল স্রোতে। তবে নিতাইয়ের অন্তর্জগতে যে বিষাদ গভীর ছায়া ফেলেছে তা থেকে সে বের হতে পারে না সহজে। গল্পকারের ভাষায়:

> (তার) প্রাণে সুখ নাই—মনেও তাই হাসি নাই। বিয়াল্লিশের দুর্ভিক্ষের পোকা মানুষের মন একেবারে কুরে কুরে খেয়েছে। দু’বছর আগের পুরানো দুর্ভিক্ষটা নিতাইয়ের নিকট আবার নূতন হয়ে দেখা দেয়। মনটা কেমন দুর্বিষহভাবে একেবারে নুয়ে পড়ে। (সরদার ২০০৬: ১৬৯)

যে মুহূর্তে মিন্নত আলীর পরামর্শ ও উৎসাহে পুরাতন ক্ষত সারিয়ে তোলার প্রচেষ্টায় নিতাই সংগ্রামরত, তখনই জনজীবন আক্রান্ত হয় মানবসৃষ্ট আরেক মহাবিপর্যয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়। ১৯৪৬ সালে সংঘটিত সেই দাঙ্গার ভয়াবহতায় বাংলার হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে নির্মম পাশবিকতায়। সমাজ-বিধায়ক খেরু সোম আর কাজেম হাজী নিম্নবিত্ত চাষাভুষাদের মধ্যে বিভাজনরেখা তৈরি করে এই দাঙ্গাকে চাঙ্গা করে রাখে। ফলে ‘আর্থ-রাজনৈতিক চাঞ্চল্যে পূজা-পার্বণ প্রভৃতি দেশজ সংস্কৃতি-নির্ভর আবহমান জীবন প্যাটার্ন ভেঙে পড়ে; মানুষের মনোজগতে সৃষ্টি হয় গভীর ক্ষত’ (চঞ্চলকুমার ২০০৯: ৭৪)। সমকালে দুর্ভিক্ষ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদির প্রতিক্রিয়ায় ভেঙে পড়ে বাংলার চিরায়ত গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা; প্রকট থেকে প্রকটতর রূপ নেয় মানুষে-মানুষে বৈষম্য। সমাজ-সংস্কৃতি-অর্থনীতি ও রাজনীতির এই ভঙ্গুর সময়পর্বের ইতিহাসের ঘটনাশ্রিত এ গল্পে জয়েনউদ্‌দীন বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের বেদনাময় রূপান্তরের একটি রেখাচিত্র অঙ্কন করেছেন বলা যায়। প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় গল্পের অংশবিশেষ স্মর্তব্য:

> নিরুপায় নিতাই মুখুজ্যে আর মিন্নত আলী অনেক চেষ্টা করেছিল গরম বাজারকে ঠাণ্ডা করতে, আগের মিল-মহব্বত ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু কার কথা কে শোনে। অবশ্য শান্তি-

> কমিটির মিটিং হয়েছিল প্রতিমাসে দু'তিনবার। ফলে আতঙ্ক দূর হয়েছিল; কিন্তু প্রাণের বাঁধন যে আলাদা হয়ে গেছিল, তা আর ফিরে জোড়া বাঁধলো না। (সরদার ২০০৬: ১৬৯)

'দ্রৌপদী' গল্পে পৌরাণিক অনুষঙ্গে গ্রামীণ সমাজের অন্তর্বাস্তবতা ও বহির্বাস্তবতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। রামায়ণ-মহাভারত, হাদিস-কোরান প্রভৃতির অপব্যাখ্যা তৈরি করে সমাজের প্রভাবশালীরা ভালো মানুষের মুখোশ পরে নিজেদের দুষ্কর্ম অব্যাহত রাখে। আলোচ্য গল্পের শরিফার মধ্য দিয়ে গল্পকার পুরুষশাসিত সমাজের নাগপাশে বন্দি নারীর নিষ্পেষিত জীবন এবং গ্রামীণ সমাজের বাস্তবতাকে করেছেন শিল্পায়িত। গল্পে কুলী, সুরমা, শরিফা—একই নারীর তিন নাম ও পরিচয়। এর পশ্চাতে রয়েছে সমাজের একাংশের কারসাজি। একটি চুরির ঘটনার তদন্ত-সূত্রে এই রহস্যের উন্মোচন করেছেন গল্পকার। 'গোবরে পদ্মফুল' দরিদ্র ঘরের মেয়ে কুলীর ওপর নজর পড়ে ঘোষ পরিবারের সন্তান এবং পরবর্তীকালে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট নীলরতন ঘোষের। অবৈধ মিলনে সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়ে কুলী। অতঃপর কুলীকে ত্যাগ করে নীলরতন বোসদের মেয়ে বিবাহ করে ঘরজামাই হিসেবে শ্বশুরের গ্রামে পাড়ি জমায়। অবৈধ সন্তানের প্রসঙ্গ সামনে এলে সে কুলীকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার কথা বলে বাজারে বিক্রি করে দেয়। একপর্যায়ে কুলীর কাতর অনুনয়ে সেখান থেকে তাকে নিয়ে এসে নিক্ষেপ করে আরেক জটিল জীবনাবর্তে। এ পর্যায়ে দারোগাকে উদ্দেশ্য করে কুলীর বক্তব্য উল্লেখযোগ্য:

> তারপর হলো এই বন্দোবস্ত। মাতব্বর সাহেব বড় দয়ালু, একদিন এসে আমায় নিয়ে গেলেন। জামাইবাবু মজিদের মোল্লাজী এদের মহাভারতের কথা শোনালেন। চার জনের করার দিলাম, কবুল পড়ে একজনের কাছে মন বান্দা দিলাম। সুরমা শরিফা হলাম ... (সরদার ২০০৬: ১৭৮)

এই সমাজ সহায়-সম্বলহীন শরিফা ওরফে কুলীকে তার অজান্তেই করেছে এ যুগের দ্রৌপদী। পৌরাণিক প্রসঙ্গের উল্লেখ-সূত্রে কুলীর এই দ্বন্দ্বজটিল জীবনাখ্যানের চিত্রায়ণে সমাজের অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি দিক প্রকটিত করেছেন গল্পকার।

'সামাজিক' গল্পে তথাকথিত সমাজরক্ষকের হাতে বলি হয়েছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কতিপয় মানুষ। গৃহী-বৈষ্ণব বৃদ্ধ নরোত্তম তার মেয়ে সরলার বিবাহ না দিয়ে মুসলমান সমাজের ইজ্জত নষ্ট করছে—এ ধরনের কথা প্রচার করেছে সমাজপতি মীর সাহেব। মুসলমানের ছেলে গহেরের সঙ্গে প্রেমের অসত্য তথ্য প্রচার করে সরলাকে 'নষ্টা' প্রতিপন্ন করতে চায় সে। এভাবে সরলাকে ভোগ করার উন্মত্ত অভিলাষে মেতে ওঠে লোলুপ মীর সাহেব। তাই কৈলাশের সঙ্গে সরলার বিয়ের সংবাদ প্রচার হওয়া মাত্রই সে হয়ে ওঠে হিংস্র। তার হিংস্রতার পরিণাম উপস্থাপন-প্রসঙ্গে নরোত্তমের অসহায় জীবনবাস্তবতা রূপময় করে তুলেছেন গল্পকার:

> নরোত্তম বড় ব্যস্ত হইয়া বিয়ের আয়োজন করিতেছে। বিয়েটা ভালোয় ভালোয় হইয়া গেলে সে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিতে পারে। ... বিয়েটা হইয়া গেলে সে জুলুমের হাত হইতে রেহাই পাইবে, এ-দেশে শান্তিতে বাস করিতে পারিবে। কিন্তু ভোরে উঠিয়া সে যখন শুনিল, কাল রাতে কে বা কাহারা কৈলাশকে খুন করিয়া ফাঁসি দিয়া গাছে ঝুলাইয়া রাখিয়াছে, তখন সে ভাবিয়া পাইল না, সত্যই কি বড় লোকের জুলুমের শেষ নাই? (সরদার ২০০৬: ১৮৫)

'বকসো আলী পণ্ডিত' সমকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির রূপায়ণে সমৃদ্ধ একটি গল্প। গ্রামের পাঠশালার পণ্ডিত বকসো আলী। সে অভাবী, ঋণগ্রস্ত হলেও সততার প্রশ্নে অনড়। গল্পে বকসো আলীর জীবনকাহিনি বর্ণন-প্রসঙ্গে দেশভাগ ও ভাষা-আন্দোলনের মতো ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এ গল্পে সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে গল্পকার শৈল্পিক নিরাসক্তিতে করেছেন সমীকৃত। উনিশশ সাতচল্লিশে সুদিনের আশায় সাধারণ জনতা আজাদির আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল। বকসো আলী পণ্ডিতও এ সময় সবার আগে 'চাঁদ আঁকা নিশান লইয়া গলা ফাটাইয়া বলিয়াছিল পাকিস্তান।' কিন্তু বাস্তবতা হয়েছে অন্য রকম। তাই পণ্ডিতের আফসোস:

> আজ সে সব কথা মনে হইলে পণ্ডিতের খুব দুঃখ হয়, সুখ হইবে দুঃখ-কষ্ট যাইবে, ভাত-কাপড় পাইবে, কেন এত সব মিথ্যা প্রলোভন সে এই নির্বোধ চাষা-ভুষো সরল লোকদের দিয়াছিল। (সরদার ২০০৬: ১৮৮)

প্রকৃতঅর্থে পাকিস্তান আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠার ফলভোগী হয়েছে সমাজের বিশেষ একটি শ্রেণি। গহের হাজী তাদের অন্যতম। পণ্ডিতকে সে স্কুলে বাংলা পড়ানো স্থগিত করে আরবি-উর্দু পড়ানোর নির্দেশ দেয়। কিন্তু পণ্ডিতের এক কথা—'আমাদের জন্ম যখন হয়েছে বাংলাদেশে তখন বাংলাতো শিখতে হবেই। কেন না বাংলা মায়ের জবান, মনের কথা বাংলায় খোলাসা করে বলতে পারি' (সরদার ২০০৬: ১৮৯)। পরিণামে গহের হাজী বাড়ি বাড়ি গিয়ে বাংলা পড়ার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করে পণ্ডিতকে ঠেলে দেয় মানবেতর জীবনের দিকে। জনসম্মুখে সে ফইজদ্দির পালানের জমিটুকুও দখল করে নেয়। বিত্তহীন পণ্ডিতের ক্ষমতা নেই এর জোরালো প্রতিবাদ করার। একদা রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের মাধ্যমে জার শাসনের অবসান ঘটিয়ে যেমন প্রতিষ্ঠা পেয়েছে সমাজতন্ত্র, তেমনি এ দেশেও হয়তো অত্যাচারের মাত্রা চরমে পৌঁছালে প্রচলিত শাসনযন্ত্রকে উৎখাত করে প্রতিষ্ঠিত হবে সমাজতন্ত্র—এই সান্ত্বনায় আস্থা রাখে বকসো আলী পণ্ডিত। ইতোমধ্যে তার চোখে ছানি পড়ে। ঢাকায় গিয়ে তাকে চোখের ছানি অপরেশনের পরামর্শ দেয় ফইজদ্দি। পরামর্শ অনুযায়ী ঢাকা মেডিকেল কলেজে উপস্থিত হয় সে। তখন ভাষা-আন্দোলনের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। সেদিন ছাত্রজনতার 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত মেডিকেল কলেজ ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকা। অতঃপর—

> বাইশে ফেব্রুয়ারী সকালে খবরের কাগজে খবর বাহির হইয়াছিল, গতকল্য মেডিক্যাল কলেজের নিকটে বাংলা ভাষার দাবীতে বিক্ষোভরত ছাত্র জনতার উপর পুলিশ পর পর কয়েক রাউণ্ড গুলি ছুঁড়ে। ফলে দুইজন ছাত্র ও একজন অজ্ঞাতনামা বৃদ্ধ ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। (সরদার ২০০৬: ১৯৪)

গুলির আঘাতে মাথার খুলি উড়ে-যাওয়া বৃদ্ধ আর কেউ নয়, দুর্ভাগ্য-প্রপীড়িত পণ্ডিত বকসো আলী। জীবনযুদ্ধে লড়াকু এই পণ্ডিত ঘুণে ধরা সমাজে আপসকামীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়নি। ভাষা-আন্দোলনের গৌরবময় ইতিহাসের সঙ্গে এই সংগ্রামী সত্তা একাকার হয়ে গেছে।

'আলীজান' গল্পের মূল বিষয়বস্তু গ্রাম থেকে উদ্বাস্তু হওয়া আলীজানের স্বগত-কথনে বিন্যস্ত। একদিন তার ছিল 'তালুকদারী, ছেলে-মেয়ে-বউ, সোনার সংসার' সবকিছু। খাজনা, নিলাম,

ডিক্রিজারি প্রভৃতিতে জড়িয়ে জমিদারের পক্ষে দখলদারির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় সে। জমিদারের অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় ফতে আলী পণ্ডিতকে হত্যা করেছে, পণ্ডিতের সোমত্ত মেয়েকে লুণ্ঠন করে জমিদারকে তুষ্ট করার ব্যবস্থা করেছে। হত্যাকাণ্ডের দায়ে ভোগ করেছে জেলজীবনের অভিজ্ঞতা। অতঃপর সর্বস্ব খোয়ানোর পর আলীজান উপলব্ধি করেছে শোষকের প্রকৃত রূপ। ঢাকা শহরের পিচঢালা উত্তপ্ত রাস্তায় রিকশা চালাতে গিয়ে প্রতি পদে সে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য হয়েছে অনুতপ্ত। তার মধ্যে জেগে উঠেছে প্রতিবাদী চেতনা। এখন সকলের সঙ্গে ঐক্যের বন্ধন গড়ে নব উদ্যমে বাঁচতে চায় সে:

> দু'টো টাকা হাতে হলেই দেশে গিয়ে আবার ঘর গৃহস্থালী শুরু করবো। এতদিন না বুঝে যাদের সাথে দুশমুনী করেছি, তাদের কাছে জোড় হাতে ক্ষমা চাইব। তাদের সাথে মিশে এবার ন্যায়ের জন্যে তাদেরি মত রুখে দাঁড়াব—লড়বো। ... কেন বাপু আমাদের কি বাঁচতে হবে না, আমরা কি মানুষ না।' (সরদার ২০০৬: ২০০)

সরদার জয়েনউদ্‌দীনের আলোচিত ছোটগল্পের প্রায় পুরো পরিসর জুড়ে বর্ণিত হয়েছে গ্রামীণ মৃত্তিকামূল-ঘনিষ্ঠ মানুষের যাপিত জীবনের অকৃত্রিম ভাষ্য। বস্তুত, গত শতাব্দীর চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে গ্রামীণ জীবনে বিদ্যমান বাস্তবতা তাঁর ছোটগল্পে বিশ্বস্ত শিল্পাবয়ব পেয়েছে। প্রান্তিক মানুষের শ্রীহীন জীবনকে শিল্পান্তর্গত করে তিনি যেমন নাগরিক মানসের অভিজ্ঞতালোক প্রসারিত করতে চেয়েছেন, ঠিক তেমনি সেই জীবনধারায় পরিবর্তন আসুক—এটিও মনেপ্রাণে প্রত্যাশা করেছেন। 'সমাজ পরিবর্তনের দীপ্র-আকাঙ্ক্ষা হয়তো তাঁর ছিল না, কিন্তু যে-সমস্ত বিষয় সামাজিক শান্তি-স্থিতি-শৃঙ্খলাকে সংহত-সুন্দর অথবা বিনষ্ট করে তা অঙ্কনেও তিনি পরাঙ্মুখ ছিলেন না' (গিয়াস ২০১৯: ৮৬)। সামন্ত প্রভুদের অনাচার, সমাজপতিদের ষড়যন্ত্র ও কূটকৌশল, সাধারণ মানুষের বঞ্চনা ও হাহাকার, পরিবার ও সমাজপরিসরে নারীর দুর্ভোগ ও যন্ত্রণাময় জীবন, শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে বিক্ষিপ্ত প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের যে চিত্র তিনি তাঁর ছোটগল্পে প্রদর্শন করেছেন তা তুলনারহিত। এই তীক্ষ্ণ সমাজসচেতনতার জন্য সরদার জয়েনউদ্‌দীনকে সমাজবীক্ষক গল্পকার অভিধায় অনায়াসে অভিহিত করা যায়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

আজহার ইসলাম (২০১৪)। *বাংলাদেশের ছোটগল্প: বিষয়-ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য*। ঢাকা: অনন্যা প্রকাশ।

গিয়াস শামীম (২০১৯)। *উপন্যাসের শিল্পস্বর*। ঢাকা: ভাষাপ্রকাশ।

চঞ্চলকুমার বোস (২০০৯)। *বাংলাদেশের ছোটগল্পের শিল্পরূপ*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন (১৯৯৭)। *বাংলাদেশের ছোটগল্প: জীবন ও সমাজ*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

শফিকুর রহমান (২০১৩)। *বাংলাদেশের গ্রামভিত্তিক ছোটগল্পে জীবন, সমাজ ও সংস্কৃতি*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

সরদার জয়েনউদ্‌দীন (২০০৬)। *গল্পসমগ্র*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় (১৩৬৭)। *পূবালী* ১ম বর্ষ, চৈত্র। ঢাকা।